বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন ও উত্তর : প্রতিটি প্রশ্নের মান-১০

১. "আমি এই পুস্তকে এদেশে ইংরাজদের ভালো মন্দ যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি।"—'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থে 'ইংরাজদের ভালো মন্দ' সম্পর্কে লেখিকার অভিমত ব্যক্ত করো। ১০

উত্তর ➲ **ইংরাজদের ভালো মন্দ' সম্পর্কে লেখিকার অভিমত :** ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণভাবিনী দাসী ইংলন্ডে যাত্রা করেন। এর তিন বছর পরে লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার শিল্পীত রূপ প্রকাশিত হয় 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' শীর্ষক গ্রন্থে। পর্দাপ্রথার শাস্ত্রীয় নির্দেশাবলী উপেক্ষা করে লেখিকা ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রাখেন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের নাম হলো 'পূর্বকথা'। এই 'পূর্বকথা' আসলে গ্রন্থ লেখার নেপথ্যে লেখিকার কৈফিয়ৎ। তিনি প্রথমেই বলে নিয়েছেন—

১. নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি প্রকাশ করবার অভিলাষে কৃষ্ণভাবিনী এই ভ্রমণসাহিত্য লেখেননি। এই গ্রন্থ হলো ইংল্যান্ড দর্শন সম্পৃক্ত যাবতীয় ঘটনার রসসম্মত নির্মাণ।
২. এই গ্রন্থে সমাস, সন্ধি ও অলংকারের আতিশয্য নেই।
৩. এখানে তিনি স্থূল জৈবতা প্রকাশ করেননি, বীরাঙ্গনা নারী কিংবা বীরত্বদর্শনে সার্থক পুরুষের আখ্যায়িকা রচনা করেননি, তিনি মূলত দেখাতে চেয়েছেন স্বাধীন ও পরাধীন জীবনের পার্থক্য ও উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য কতখানি।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে উপনীত হয়ে কবি দেখিয়েছেন, ইংল্যান্ডের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, জীবন-যাপনের সঙ্গে ভারতীয়দের পার্থক্য কতখানি। তিনি এই দৃশ্যনির্মাণে বা দুই সংস্কৃতির মধ্যে পরিলক্ষিত বৈপরীত্য দেখানোর সময় পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিপাতের পরিচয় দিয়েছেন। দুই সংস্কৃতির মধ্যে আকাশ-জমিন পার্থক্য দেখেছেন লেখিকা।

এই গ্রন্থ রচনার সময় কোনো কোনো বিষয়ে ইংরেজি গ্রন্থ, মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের সাহায্য নিয়েছেন। ইংরেজরা নিজেদের সম্বন্ধে কীরূপ বিচার করে এবং বিদেশিরা এদের দোষ-গুণ সম্বন্ধে কী বিবেচনা করে, তা জানার জন্যে ইংরেজ চরিত ও বিদেশি কর্তৃক লিখিত কয়েকটি বই পড়েন। এদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসি পন্ডিত মসিও টেনের রচিত ইংল্যান্ড সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ থেকে অনেক উপকার পেয়েছেন। কৃষ্ণভাবিনী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন—

Scanned by TapScanner

> ইংলন্ডে স্বাধীন জীবনের আধার, আর আমাদের ভারতে একেবারে পরাধীন।... যতদিন হইতে ইংল্যান্ডের বায়ু সেবন করিতেছি, যতদিন হইতে স্বাধীন মানুষের সহিত একত্র বাস করিতেছি, ততদিন হইতে আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে।

ইংরেজ নারীর সামাজিক, অবস্থান, প্রাত্যহিক যাপিত জীবনের সন্ধান, গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কে এই গ্রন্থে অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় চরিত্রের স্বরূপ সন্ধানে অগ্রসর হয়ে সামাজিক অবক্ষয়, নিষ্কর্মতা ইত্যাদির কথা বলতে গিয়ে আবহাওয়া, সামাজিক গঠন, পরিবার প্রথম ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। ইংল্যান্ডের মানুষরা রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন। লেখিকা একজন সামান্য ছুতারের সঙ্গে কথা বলে ইংল্যান্ডের রাজ্যশাসন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তার সে ধারণা; সেই ধারণা দেখে অভিভূত হলো। এখানকার শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল মানুষকে সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করা। আর এ সচেতনতা অর্জনের সবথেকে প্রধান উপায় হলো 'কার্যমূলক শিক্ষা'। লেখিকা জানিয়েছেন—

> এই কার্যত শিক্ষাদ্বারা আত্মোন্নতির ইচ্ছা ইংরাজ জাতির ব্যক্তিগত চরিত্রে যেরূপ উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ পায়, সেরূপ জাতি অল্প জাতির মধ্যেই দেখা যায়।

প্রতিদিন গৃহে; দোকানে, রাস্তায় ও কারখানায় মানুষ যে শিক্ষা পায়, সেই শিক্ষা আত্মোন্নতির ও জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়। ইংল্যান্ডে নারী স্বাধীনতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। সেখানে নারীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে দেশের প্রগতির রথচক্র দ্রুত এগিয়েছে। ইংল্যান্ডের দাম্পত্যজীবন আমাদের দেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইংল্যান্ডে স্বামীর কর্মের সময় ছাড়া স্বামী-স্ত্রী দু'জনে একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে আহার গ্রহণ করে, সুযোগ মতো একসঙ্গে বেড়াতে যায়, একই সঙ্গে লেখাপড়া করে এবং নিজেদের মতো করে সংসারধর্ম পালন করে। 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'লন্ডন'। এই অধ্যায়ে লেখিকা কতকগুলি তথ্য দিয়েছেন; যে তথ্যগুলি ইংরেজদের ভালো-মন্দ দিক বর্ণনায় মন্দ তথা দুর্বলতা জায়গাগুলি উঠে আসে—

১. লন্ডনের দরিদ্র লোকেরা একেবারে পশুর মতো। লন্ডনের পূর্বভাগে গেলে মনে হয় না যে, লন্ডনে একটিও ভদ্রলোক আছে বা ইংলন্ড একটি সভ্য দেশ।
২. অপেক্ষাকৃত বসবাসের অনুপযুক্ত ঘরে সাত-আট জন লোকে ছাগল-কুকুরের মতো বাস করে।
৩. ইংল্যান্ডের মতো পৃথিবীর আর কোনো স্থানে এত অসংখ্য ধনী ও এত অসংখ্য দরিদ্র লোক দেখতে পাওয়া যায় না।
৪. লন্ডনের পূর্বভাগের মানুষদের মধ্যে মারামারি ও খুনোখুনি প্রায় ঘটে থাকে।
৫. অধিকাংশ মানুষ মদ্যপ, এরা মদ খেয়ে জন্তুর মতো, পশুর মতো জ্ঞানশূন্য হয়।

এভাবে কৃষ্ণভাবিনী দাসীর 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থে ইংরেজদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে একটি ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

২. ভ্রমণ সাহিত্য হিসেবে 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থটি কতখানি বিচার্য হয়ে ওঠে তা আলোচনা করো। ১০

উত্তর ➲ ভ্রমণ সাহিত্য হিসেবে 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' : স্বামী দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহে বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যচর্চার পাঠ আয়ত্ত করেন কৃষ্ণভাবিনী দাসী। দেবেন্দ্রনাথ বিলেত যাত্রা করেন বলে তিনি সমাজে জাতিচ্যুত হন। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রাকালে

Scanned by TapScanner

আত্মীয় স্বজনদের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ছয় বছরের একমাত্র কন্যা তিলোত্তমাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর সঙ্গে বিলেত গমন করেন। বিলেতে নারী মুক্তির স্বরূপ দেখে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। স্বামীর সাহচর্যে প্রভূত অধ্যয়ন করে তিনি 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' নামাঙ্কিত গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণভাবিনী প্রথম বঙ্গ মহিলা, যিনি ইংলন্ডে থাকার সময় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে তুলে এনেছেন স্বদেশবাসীর জন্যে। অর্থাৎ তিনিই প্রথম নারীকণ্ঠ, যিনি বিদেশে অবস্থান করে বিদেশ সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি অবরোধ প্রথা থেকে বেরিয়ে আসেন। প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। যখন কোনো মন্তব্য করেছেন, তখন সেই মন্তব্যকে কোনো কুয়াশাচ্ছন্ন জটিলতার মধ্যে আবেষ্টিত করেননি। যেমন ইংলন্ড ও ভারতবর্ষের পার্থক্য বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

> ইংলন্ডে স্বাধীন জীবনের আধার, আর আমাদের ভারত একেবারে পরাধীন। কথায় বলে যে, ক্রীতদাস পর্যন্ত ইংলন্ডের মাটিতে পা দিলে তৎক্ষণাৎ স্বাধীন হইয়া যায়।

এরপরে লেখিকা জানিয়েছেন, তিনি নিজেও দেখেছেন যে, যতদিন থেকে ইংলন্ডের বায়ু সেবন করেছেন, যতদিন থেকে স্বাধীন মানুষের সঙ্গে একত্রে বাস করেছেন, ততদিন থেকে তাঁর মনে এক নতুন ভাবের উদয় হয়েছে। মূলত সামাজিক দায়বোধ থেকে এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তিনি মূলত দেখাতে চেয়েছেন ইংরেজ নারীর সামাজিক অবস্থান, দিনযাপন, গার্হস্থ্য ধর্ম, জীবনবোধ, শিক্ষা-রুচি, আচার-আচরণ এবং সর্বোপরি তাদের স্বাধীন মনোভাব। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণভাবিনী দাসী ইংলন্ডে যান। ১৮৮৫-তে প্রকাশিত হয় তাঁর এই অসামান্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত। এই গ্রন্থ সম্পর্কে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। ভারতীয় জাতীয় চরিত্রের যে দুর্বলতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তার নেপথ্যে এদেশের সামাজিক সমস্যাকেই তিনি মূলত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর দুটি বক্তব্য স্মরণীয়—

১. আমাদের দেশের একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত দুর্বলতার অধিক প্রভাব দেখা যায়।

২. যে দেশে যত অনায়াস ও বিনা পরিশ্রমে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, সেখানকার অধিবাসীরা ততবেশি অলস ও দুর্বল চরিত্র হয়ে থাকে। আমাদের দেশেই এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ভারতীয় জাতীয়জীবনে তিনি বলিষ্ঠতার অভাব দেখেছেন। পাশাপাশি দেখেছেন সামাজিক চেতনার অভাব। বিশেষত বাঙালি গৃহবধূরা অন্দরমহল থেকে বাইরে আসতে বিব্রত বোধ করে। মূলত শিক্ষা-সংস্কৃতি-দোলাচল বৃত্তি এর কারণ। তবে তিনি দেশজ সংস্কৃতিকে কখনও ছোটো নজরে দেখেননি। তাঁর মনে হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা একমাত্র পারে নারীদের চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষ সাধন করতে।

কৃষ্ণভাবিনী দেখেছেন শিক্ষাকে অবলম্বন করে ইংরেজরা ইউরোপে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। তারা তাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। এই সচেতনতা অর্জনের প্রধান উপায় হলো কার্যমূলক শিক্ষা। এই শিক্ষা তারা অর্জন করতে পেরেছে বলে তাদের আত্মোন্নতির পথে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে নারীস্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি দেখেছেন ইংলন্ডে গৃহের অবরোধ ছিল না। অনাত্মীয়ের সঙ্গে মেলামেশায় কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। নারীর সহজ-সামাজিক কাজকর্ম, বিদ্যাচর্চা, পুরুষের পাশাপাশি চলার মানসিকতা এবং সর্বোপরি

Scanned by TapScanner

ব্যক্তিত্ব লেখিকাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইংরেজ মেয়েদেরও ঐতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। তারাও ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন। তাই কৃষ্ণভাবিনী লিখেছেন—

> ইংরাজ মহিলার যদি ধর্ম্মভয় না থাকিত, তাহা হইলে ইংলন্ডের উন্নতি ও গৌরব হইত না এবং ইংরাজরা অন্যান্য সভ্যজাতির আদৃত বা সম্মানিত হইত না।

শুধুমাত্র সংস্কারকে আঁকড়ে ধরা মেয়েরাই সতীত্বের গৌরব জানে তা নয়, বিজ্ঞান-দর্শন-পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারনায় বিশ্বাসী মেয়েরাও নারীত্ব-ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে সচেতন। তিনি ভারতীয় চিন্তা-চেতনার সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনার কয়েকটি পার্থক্যের জায়গা দেখিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে—

১. সংসারে অবরূদ্ধা স্ত্রী কীভাবে দিন যাপন করে তা স্বামীরা খোঁজ রাখে না।
২. তথাকথিত বাবু সম্প্রদায় নিজের মতো করে একটি যাপিত জীবন গ্রহণ করে থাকে। সেখানে তার নিজের পত্নীর প্রবেশাধিকার নেই।
৩. স্ত্রী যতখানি স্বামী সম্পর্কে সচেতন থাকে, স্বামী ততখানি স্ত্রী সম্পর্কে সচেতন নয়। প্রাবন্ধিকের স্পষ্ট অভিমত এই যে, "স্ত্রী পুরুষ যথার্থে কী সম্পর্ক তা আমাদের দেশে অল্প লোকেই বুঝেন।"

'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' নামাঙ্কিত এই গ্রন্থে দীর্ঘ আট বছর বিলেতে বাসকালে লেখিকার যে চিন্তা-চেতনা-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে, তার মূল কারণ ছিল অধিকাংশ সময় গ্রন্থাগারে বইপত্রের সঙ্গে সংযোগ। এই ভ্রমণ গ্রন্থের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—

১. কলকাতা থেকে বোম্বাই তথা মুম্বাই আসার বিস্তৃত বিবরণ লেখিকা দিয়েছেন।
২. মাঝে-মধ্যে এক-একটি শহর সম্পর্কে তিনি অসামান্য বর্ণনা করেছেন।
৩. তৃতীয় অধ্যায়ে বোম্বাই থেকে ভেনিস যাওয়ার অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে। সেখানে তিনি জাহাজের কর্মচারীদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।
৪. সুয়েজ খাল সম্পর্কে লেখিকা সবিস্তারে বলেছেন। সুয়েজ খাল যে যাতায়াতের পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সে সম্পর্কে তিনি সুন্দর বর্ণনা করেছেন।
৫. চতুর্থ অধ্যায়ে ভেনিস থেকে লন্ডনের প্রসঙ্গ এসেছে। ভেনিস প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য "পৃথিবীতে এরকম স্থান আর কোথাও নাই।"
৬. মাঝে-মধ্যে প্রকৃতির অনুপম বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। তাঁর চোখে ধরা পড়েছে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, ভীমাকার গুহা, ঝরনার অপূর্ব সুন্দর জল ও প্রাকৃতিক নির্জনতা।
৭. সুইটজারল্যান্ড তাঁর অত্যন্ত পছন্দের। তিনি লিখেছেন, এখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। দুদিকে ঝরনার জল পড়ে মাঝে-মাঝে ছোটো নদী ও হ্রদ তৈরি হয়েছে। এখানে বছরের আট মাস শীতকাল। কার্তিক মাস থেকে রীতিমতো বরফ পড়ে। শীতকালে সুইটজারল্যান্ড দেখতে বড়ো চমৎকার।

ভ্রমণের ক্লান্তি নিঃসন্দেহে লেখিকাকে আচ্ছন্ন করেছিল। অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে তিনি লন্ডন পৌঁছান। সেদিন ছিল রবিবার। গৃহে তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এরপর লন্ডনে তাঁর বাস। সেই সূত্র ধরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে "লন্ডন"। এই অধ্যায়ের সূচনাতেই তিনি বলে নিয়েছেন, লন্ডন একটা প্রকাণ্ড নগর। এইরূপ নগর পৃথিবীর আর কোনো দেশে

Scanned by TapScanner

নেই বললেই চলে। কলকাতার প্রায় চার গুণ জায়গা নিয়ে লন্ডন অবস্থিত। একটা গাড়ি করে পাঁচ ছয় দিন ক্রমাগত লন্ডনের চারিদিকে ঘুরে বেড়ালেও এই নগর দেখে শেষ করা যায় না। চারিদিকে শত শত নতুন বাড়ি। ফাঁকা জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। লন্ডনকে একজন ভারতবর্ষীয় 'বিজ্ঞানপনের নগর' বলে চিহ্নিত করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে লেখিকা ইংরেজ জাতি ও তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি বলেছেন, প্রভূত অর্থ থাকার ফলে ইংরেজরা অত্যন্ত অহংকারী— "বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও প্রভূত অর্থরাশি ইহাদিগকে একেবারে গর্বোন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।" লেখিকা মাঝে-মধ্যেই ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার জায়গা অন্বেষণ করেছেন! তিনি দেখেছেন—

> হিন্দুদের মতো ইংরাজদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, কিন্তু এখানে ভয়ানক শ্রেণিভেদ দেখিতে পাই। এই শ্রেণিভেদ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নয়, অর্থই ইহার একমাত্র মূল। লর্ডেরা তাহাদের সন্তানদের কখনও সামান্য লোকদের ছেলেমেয়ের সহিত বিবাহ দেয় না, ধনীরা সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে কখন দরিদ্রদের সহিত নিজ পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে অগ্রসর হয় না।

এভাবে লেখকের নিজস্ব মত, চিন্তা-ভাবনা এবং সর্বোপরি লন্ডন প্রদক্ষিণ করে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃতাকারে তিনি তুলে ধরেছেন 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' নামাঙ্কিত গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি সার্থক ভ্রমণসাহিত্য রূপে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে।

Scanned by TapScanner